প্রধান ধর্মসমূহে
স্রষ্টার ধারণা
Concept Of God
In Major Religions

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ কথা

স্রষ্টা অনেকের কাছেই একটি প্রহেলিকা, একটি রহস্য। কারো কাছে আবার বোধের অতীত একটি ধারণা মাত্র। অথচ পৃথিবীর অনেক মানুষই এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না। বিভিন্ন ধর্ম এবং এর নৈতিক নিয়ম-পদ্ধতির উপস্থিতি বর্তমান সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সৃষ্টির কার্যকারণ এবং বস্তু সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে শুরু থেকেই সকল যুগের মানুষের কৌতূহলের শেষ ছিল না। স্যার আর্নল্ড টয়েনবি বিভিন্ন যুগের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এবং এর ফলাফল দশ খণ্ডে বিভক্ত এক স্মরণীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তার অধ্যয়নের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন, 'মানব ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে ধর্ম।' ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত দি অবজারভার পত্রিকার ২৪ অক্টোবর সংখ্যায় তিনি লিখেছেন–'আমি এ বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করেছি যে মানব অস্তিত্বে রহস্যময় ভূমিকা পালন করে ধর্ম।' অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'ধর্ম' অর্থ 'অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিতে বিশ্বাস, বিশেষত বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাস, যাকে পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করা যায়।'

প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি সর্বজনীন 'স্রষ্টায়' বিশ্বাস করা অথবা একটি অতি প্রাকৃতিক সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তৃপক্ষে বিশ্বাস। এই ধর্মগুলোর অনুসারীরাও মনে করে যে, তারা যে স্রষ্টার উপাসনা করে সে একই স্রষ্টার উপাসনা অন্যেরাও করে। ধর্মহীন মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকসহ মার্ক্সবাদ, ডারউইনবাদ ও ফ্রয়েডিয় মতবাদে বিশ্বাসীরা প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের মূলোৎপাটনে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকারান্তরে এসব প্রচেষ্টা ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কমিউনিজম যখন অনেক দেশে বিস্তার লাভ করে তখন তারাও ধর্মকে একইভাবে চিহ্নিত করে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে। কিন্তু তাতে ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ধর্ম মানবীয় অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ

ধর্ম নিয়ে যে আলোচনা ও গবেষণাই করা হোক না কেনো, ধর্ম মূলত মানবীয় অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো স্রষ্টা। পৃথিবীর সকল মানুষেরই স্রষ্টা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। তাই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে আমরা স্রষ্টাকে বোঝার চেষ্টা করবো, স্রষ্টার ধারণাকে ব্যাখ্যা করবো। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আলে ইমরান–এর ৬৪ তম আয়াতে বলা হয়েছে -

قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! এসো সেই ঐক্যবাণীর ভিত্তিতে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন; তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি এবং কোনো কিছুকেই যেন তার শরীক সাব্যস্ত না করি, আর আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করি। তৎপর যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে তোমরা তাদেরকে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম।'

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলে আমার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। এ অধ্যয়ন আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে। আমি নিশ্চিত হয়েছি, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানবাত্মাকে কিছু কিছু জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এমন যে, হয় তো সে স্রষ্টার অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়, নয়তো সে স্রষ্টার বিপরীত সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, আল্লাহতে বিশ্বাস কোনো শর্তসাপেক্ষ বিষয় নয়, বরং শর্ত সাপেক্ষ বিষয় আল্লাহতে বিশ্বাস না করা।

সেমিটিক-অসেমিটিক ধর্ম

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোকে প্রথমত দুটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা যায়–সেমিটিক ও নন-সেমিটিক। নন-সেমিটিক ধর্মগুলোকে আবার আর্য এবং অনার্য–এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

সেমিটিক ধর্ম

মূলত সেমিটীয় তথা হিব্রু, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেমিটিক ধর্মগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। বাইবেলের বর্ণনানুসারে নূহ (আ) এর এক

পুত্রের নাম ছিল 'শাম'। শাম-এর বংশধরগণ 'সেমিটীয়' নামে পরিচিত। সুতরাং সেমিটিক ধর্মগুলোর উৎপত্তি হয়েছে ইহুদি, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয়দের মধ্যে। প্রধান প্রধান সেমিটিক ধর্মগুলো হলো–ইহুদি মতবাদ, খ্রিস্টীয় মতবাদ এবং ইসলাম। এ ধর্মগুলো পয়গাম্বরীয় ধর্ম যা আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক আনীত হয়েছে।

অসেমিটিক ধর্ম

অসেমিটিক ধর্মগুলোকে আবার এরিয়াল বা আর্য এবং নন-এরিয়াল বা অনার্য–এ দুভাগে ভাগ করা যায়।

আর্য ধর্ম

আর্য জাতির মধ্যেই আর্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি। আর্য জাতি ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। এরা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ইরান এবং উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

আবার বৈদিক ও অবৈদিক এ দু'ধারায় আর্য ধর্মগুলো বিভক্ত ছিল। বৈদিক ধর্মকে 'হিন্দুবাদ' বা 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। আর অবৈদিক ধর্মগুলো হলো - শিখবাদ, বুদ্ধবাদ, জৈনবাদ ইত্যাদি। সবকটি আর্য ধর্মই অপয়গাম্বরীয় ধর্ম অর্থাৎ কোনো নবী রাসূল কর্তৃক এসব ধর্ম প্রবর্তিত হয়নি। জরথুস্ত্রীয় ধর্মও একটি আর্য ও অবৈদিক ধর্ম যা হিন্দুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এ ধর্মের অনুসারীদের দাবী হলো যে এটা পয়গাম্বরীয় ধর্ম।

অনার্য ধর্ম

বিভিন্ন প্রকারে অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। 'কনফুসীয়' ও 'তাও'বাদের উৎপত্তি হয়েছে চিনে। আবার 'শিন্টো' ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে জাপানে। এ সব অনার্য ধর্মসমূহে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। এসব ধর্মকে বড়জোর কিছু কিছু নৈতিক নিয়মাবলির সমাহার বলা যেতে পারে।

স্রষ্টা সম্পর্কিত ধারণা

কোন ধর্মের অনুসারীদের ব্যবহারিক জীবনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া সৃষ্টা সম্পর্কিত তাদের ধারণা কী তা বিচার করা যায় না। এমনকি অনেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে 'স্রষ্টা' সম্পর্কে কী বর্ণনা আছে তা অবহিত নয়। কাজেই কোনো ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে 'স্রষ্টা' সম্পর্কে কী ধারণা দেয়া আছে সেটাই বিশ্লেষণ করা উত্তম। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে 'স্রষ্টা' সম্পর্কিত যে ধারণা উল্লেখিত আছে সেটাই এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

Contents

হিন্দুধর্মে স্রষ্টা

আর্য ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। 'হিন্দু' শব্দটি মূলত একটি ফারসি শব্দ। সিন্ধু উপত্যকার আশে-পাশে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদে বিশ্বাস সম্বলিত একটি সাধারণ ধর্ম যার অধিকাংশ 'বেদ, 'উপনিষদ', এবং 'শ্রীমৎ ভগবতগীতা' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল।

হিন্দু ও মুসলিমের বিশ্বাস ও ধারণাগত পার্থক্য

বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম হিন্দুধর্ম। অধিকাংশ হিন্দুই এ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারা 'বহু ঈশ্বর'-এ বিশ্বাস করে। কোনো কোনো হিন্দু তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কিছু হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও বিশ্বাসী, অর্থাৎ ৩ শত ৩০ মিলিয়ন দেবতা। তবে শিক্ষিত হিন্দুরা যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন তারা বলেন, একজন হিন্দুর উচিত এক ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এক ঈশ্বরের পূজা করা।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা ও বিশ্বাসে। সাধারণভাবে হিন্দুদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ তথা সর্বভূতে ঈশ্বর অর্থাৎ সবকিছুতে ঈশ্বর আছেন। জৈব-অজৈব সব কিছুই ঐশ্বরিক এবং পবিত্র–এটিই হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদের মূলকথা। সেই বিশ্বাসের আলোকেই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীবজন্তু এমনকি মানব প্রজাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করে এবং সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর।

অন্যদিকে ইসলাম মানব সমাজের কাছে এই ধারণা প্রদান করে যে, মানুষ নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিক সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টির নমুনা মাত্র- এসব কিছু আল্লাহ নয়। অন্য কথায় মুসলমানরা বিশ্বাস করে সবকিছুর মালিক আল্লাহ। গাছপালা, সূর্য-চন্দ্র এবং এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো apostrophe 's' অর্থাৎ হিন্দুরা বলে, 'সবকিছুই ঈশ্বর' আর মুসলিমরা বলে, 'সবকিছুই আল্লাহ'র।

পবিত্র কুরআন বলেছে -تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ.

অর্থঃ এসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার একটি সাধারণ বিষয়ে। প্রথম সাধারণ বিষয় হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

আসুন, আমরা হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে তা থেকে উভয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যগুলো বের করার চেষ্টা করি।

ভগবদ্‌গীতা

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো 'শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতা'। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোক দেখুন -

"ঐ সব লোক যাদের বুদ্ধি মেধা বস্তুতান্ত্রিক ইচ্ছে কর্তৃক আচ্ছন্ন, তারা সাকার ঈশ্বরের এবং তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে।" *(ভগবদ্‌গীতা, অধ্যায় ৭, শ্লোক ২০)*

গীতার বর্ণনা–যারা বস্তুবাদী তারা সাকার ঈশ্বরের পূজা করে অর্থাৎ সত্যিকার নিরাকার ঈশ্বরের পাশাপাশি পূজা করে সাকার (যার আকার আছে, যেমন মূর্তি) ঈশ্বরের।

উপনিষদ

উপনিষদকে হিন্দুরা পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে। এ গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের স্রষ্টা সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে। এবার উপনিষদের শ্লোকগুলোর পাশাপাশি কুরআনের আয়াতের সাদৃশ্যগুলোর লক্ষ্য করুন।

- "একম ইভাদ্বিতীয়ম" অর্থাৎ তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া।'

  (Chandgya উপনিষদ ৬: ২ : ১)

- "তার কোনো মাতা-পিতা নেই, কোনো প্রভুও নেই।"

  (Svetasa vatara উপনিষদ), দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৬৩)

- "তার মতো কিছুই নেই।"

  "তাঁর মতো কিছু নেই যার নাম মহিমময় উজ্জ্বল।"

  (Svetasa vatara উপনিষদ অধ্যায় ৪ : ১৯)

  দ্রষ্টব্য : (The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ. ৭৩৬ ও ৭৩৭)
  (প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলি, ভলিউম ১৫, উপনিষদ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)]

  উপরোক্ত ৩টি শ্লোকের সাথে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তুলনা করুন. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

  অর্থ ঃ তাঁর সদৃশ কিছু নেই [কেউ নেই]। *(সূরা ইখলাস : ৪)*

  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

  অর্থ ঃ কোনো কিছুই এমন নেই যা তাঁর মতো হতে পারে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা : ১১)*

- অনুরূপভাবে উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকটিও আল্লাহর প্রকৃত রূপ ধারণ করতে মানুষের অক্ষমতা প্রকাশ করেছে -

"তাঁর রূপ দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখে দেখেনি; যারা হৃদয় ও আত্মা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করে, তার উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারাই অমরত্ব লাভ করে।" *(Svetasa vatara উপনিষদ, ৪ : ২০)*

পবিত্র কুরআন উপরোক্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশ করেছে -

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

অর্থ ঃ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুবিজ্ঞ। (সূরা আন্'আম ঃ ১০৩)

বেদ

হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হলো বেদ। তাদের প্রধান 'বেদ' ৪টি-ঋগবেদ, জজুর্বেদ, শামবেদ ও অথর্ববেদ।

ঋগবেদ

ঋগবেদ হলো সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ঋগবেদে উল্লেখ আছে যে, 'জ্ঞানী ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে।' *(ঋগবেদ ১ : ১৬৪ : ৪৬)*

গ্রন্থটিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কমপক্ষে ৩৩টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগ উল্লেখিত হয়েছে ঋগবেদ ২য় পুস্তকে ১ম শ্লোকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উল্লিখিত গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে সুন্দরতম নাম হলো 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ 'স্রষ্টা'। এ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'খালিক'।

এক্ষেত্রে 'ব্রহ্মা' দ্বারা Creator বা 'স্রষ্টা' বুঝানো হলে এবং এর দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বোঝালে মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মুসলমানরা কখনো এমত সমর্থন করে না যে, 'ব্রহ্মা'-ই স্রষ্টা বা খালিক যার মাথা ৪টি। (আমরা এরূপ বিভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই) মুসলমানরা চরমভাবে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 'জড়বিজ্ঞান' শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রকাশ করা স্বয়ং জজুর্বেদের নিম্নোক্ত বক্তব্যেরও পরিপন্থী–

'ন তস্যৎ প্রতিমা অস্তি' অর্থাৎ 'তার কোনো সদৃশ বা প্রতিমা নেই।' *(জজুর্বেদ ৩২:৩)*

ঋগবেদ দ্বিতীয় পুস্তক প্রথম চরণ ৩য় শ্লোক- এ উল্লিখিত হয়েছে 'বিষ্ণু' অর্থাৎ 'প্রতিপালক' যার আরবি প্রতিশব্দ 'রব' এক্ষেত্রেও মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 'রব'; 'সাসটেইনার' বা 'বিষ্ণু' নামে ডাকা হবে। কিন্তু হিন্দুদের সর্বজনীন ধারণা বিষ্ণুর হাত চারটি। তিনি ডান দিকের এক হাতে 'চক্র'

(ভারী চাকা), আর বাম দিকের এক হাতে 'কঞ্চ (শামুক) ধারণ করে আছেন। তিনি একটি পাখির কিংবা সাপের ওপর উপবেশন করে আছেন। মুসলমানরা কখনো ঈশ্বরের এমন ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। উপরোল্লিখিত বিশ্বাসও জজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায় ১৯তম শ্লোকের সাথে সাংঘর্ষিক।

এছাড়াও ঋগবেদের ৮ম পুস্তকের ১ম চরণের ১ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে –
"বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর।"
[উৎস : ঋগবেদ সংহিতি Vol-9, পৃ. ১ ও ২ স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার]

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের বিভিন্ন শ্লোকে স্রষ্টার গুণ বা সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। স্রষ্টার প্রশংসা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে– "দেব মহা অসি" অর্থাৎ ঈশ্বর অত্যন্ত মহান।

(অথর্ববেদ ৩০ : ৫৮ : ৩)

"যথার্থই তুমি আলোময়, তোমার প্রকাশ মহান : তুমিই সত্য, অদ্বিতীয়, তোমার প্রকাশ মহান, যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত, সত্যই মহান তোমার প্রকাশ, হে ঈশ্বর!"

(অথর্ববেদ সংহিতা ভলিউম ২ উইলিয়াম সাইট হুইটনি, পৃ. ৯১০)

কুরআন মাজীদের সূরা রা'দ-এর ৯ নং আয়াতে অনুরূপভাবে আল্লাহর সিফাত প্রকাশিত হয়েছে– عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

অর্থ ঃ তিনিই একমাত্র মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

জজুর্বেদ

ক. জজুর্বেদেও স্রষ্টার ধারণা সংক্রান্ত বেশকিছু শ্লোক রয়েছে। এখানে সৃষ্টি কর্তার সত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে – 'তার কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই।'

(জজুর্বেদ ৩২ : ৩)

এতে আরো উল্লেখিত আছে -
- "যেহেতু তিনি কিছু থেকে, কারো থেকে জন্ম নেননি, তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।"

"তাঁর কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, তাঁর মহিমা অত্যন্ত মহান। তিনি তাঁর মধ্যে সকল উজ্জ্বল বস্তু ধারণ করেন। যেমন সূর্য। তিনি যেন আমার অকল্যাণ না ঘটান- এটাই আমার প্রার্থনা। যেহেতু তিনি কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত।" (জজুর্বেদ : দেবীচাঁদ এম. এ. পৃ. ৩৭৭)

Contents

□ "তিনি আলোময়, নিরাকার, নিস্পৃশ্য, পবিত্র, যাকে শয়তান বিদ্ধ করতে পারে না; তিনি অদৃশ্য, প্রাজ্ঞ, পরিবেষ্টনকারী; তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করেন, তিনি চিরঞ্জীব।' *(জজুর্বেদ ৪০:৮)*

(উৎস : জজুর্বেদ সংহিতা: আই.এইচ গ্রীফিথ পৃ. ৫৩৮)

□ "তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে; যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি। তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়- যারা শম্ভুতির উপাসনা করে। 'শম্ভুতি' হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা ইত্যাদি।

(জজুর্বেদ ৪০ : ৯)

জজুর্বেদে স্রষ্টার মহিমা প্রকাশের পর সূরা ফাতিহার মতো একটি প্রার্থনার উল্লেখ আছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে –

"আমাদের ভালো পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের পাপরাশি মুছে ফেলুন যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে।" *(জজুর্বেদ ৪০ : ১৬)*

বেদান্তবাদের ব্রহ্মস্তুতি

হিন্দু বেদান্তবাদের ব্রহ্মস্তোত্র হলো– 'একম ব্রহ্মা, দ্বিতীয়া ন্যস্ত নেহন ন্যস্ত কিঞ্চন।' অর্থাৎ 'ঈশ্বর এক দ্বিতীয় নেই। মোটেই নেই মোটেই নেই, একেবারেই নেই।' যা হোক হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত বিষয়ের মাধ্যমে আমরা হিন্দুধর্মে 'ঈশ্বর' এর ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলাম।

শিখ ধর্মে স্রষ্টা

শিখ একটি আর্য ধর্ম। এটি অসেমিটিক ও অবৈদিক ধর্মও বটে। এই ধর্মটি প্রধান ধর্মসমূহের তালিকাভুক্ত নয়। এটা হিন্দু ধর্মেরই একটি বিশেষ শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত। এ ধর্মটির উৎপত্তি ঘটেছে পাকিস্তান অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে; পঞ্চনদের অববাহিকায়। শিখ ধর্মের প্রবক্তা গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্র) হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তিতে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

'শিখবাদ'

'শিখ' শব্দটি 'শিষ্য' শব্দ থেকে উদ্ভুত। শিষ্য অর্থ ভক্ত বা অনুসারী। 'শিখ' ধর্ম দশজন গুরুর ধর্ম। প্রথম গুরু হলেন গুরু নানক এবং ১০ম ও শেষ গুরু হলেন গুরু গোবিন্দ শিং। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ শ্রী গুরুগ্রন্থ যাকে 'আদি গ্রন্থসাহেব' বলা হয়ে থাকে।

শিখদের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক 'শিখ'-কে পাঁচ 'ক' ধারণ করতে হয়। এটা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি বহন করে। নিম্নোক্ত ৫টি বৈশিষ্ট্যই শিখদেরকে হিন্দুদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

১. 'কেশ'- অকর্তিত কেশ বা চুল, যা সকল গুরুই রাখে।

২. 'কঙ্গ'- চিরুনী যা চুলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবহার করা হয়।

৩. 'কাদা'- লোহা বা অন্য ধাতুর তৈরি বালা বা কঙ্কন, যা শক্তি-ক্ষমতা বা আত্মসংযমের প্রতীক।

৪. 'কৃপাণ' - ত্রিফলা খঞ্জর যা আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।

৫. 'কাচ্চা'- জানু পর্যন্ত লম্বা অন্তর্বাস বিশেষ যা কর্মতৎপরতার পক্ষে সুবিধাজনক।

শিখ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস

শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের শুরুতে 'মূলমন্ত্র' উদ্ধৃত করে থাকে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে–এটা তাদের মৌলিক বিশ্বাস, যা 'গ্রন্থ সাহেব'-এর শুরুতে উল্লেখিত আছে।

গ্রন্থসাহেব-এর প্রথম খণ্ডের, জাপূজী অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে– "ঈশ্বর মাত্র একজন যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে ঊর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়।"

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। এ ধর্ম এই সার্বভৌম বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যাকে 'এক ওমকারা' বলা হয়। 'ওমকারা' পরিচয় প্রকাশে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখিত হয়েছে–

'করতার'– স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

'সাহিব'– প্রভু।

'অকাল'– আদি-অন্তহীন।

'সত্যনামা'– পবিত্র নাম।

'পরওয়ারদিগার'– প্রতিপালক।

'রহীম'– দয়াময়।

'করিম'– সদাশয়।

তাঁকে 'ওয়াহি গুরু' অর্থাৎ একক সত্য ঈশ্বরও বলা হয়। শিখ ধর্মে বিশ্বাসীরা কঠোরভাবে একত্ববাদী– তারা 'অবতারবাদ'-এ বিশ্বাস করে না। 'অবতারবাদ'

হলো ঈশ্বরের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন সংক্রান্ত মতবাদ। তাদের মতে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো অবতার রূপে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন না। তারা মূর্তি পূজারও ঘোর বিরোধী।

শিখ ধর্মে কবীর এর প্রভাব

'কবীর' নামক এক মুসলিম সাধকের শিক্ষায় প্রভাবিত হন গুরু নানক। 'শ্রী গুরু নানক সাহেব' এর বিভিন্ন অধ্যায়ে সাধক কবীর রচিত চরণগুলো উল্লেখিত আছে। কয়েকটি চরণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

"দুঃখ মেঁ সুমিরানা সব করেঁ সুখ মেঁ করেঁ না কয়া জু সুখ মেঁ সুমিরানা করেঁ তু দুখ কাহে হুয়ে"।

অর্থাৎ, বিপদে পড়লে সবাই স্রষ্টাকে স্বরণ করে, কিন্তু শান্তি ও সুখের সময় কেউ তাঁর স্মরণ করে না। যে শান্তি ও সুখের সময় তাঁকে স্মরণ করবে তার কেন বিপদ হবে?"

এবার ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উপরোক্ত চরণের সাথে তুলনা করুন–

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۔

অর্থ : আর যখন মানুষের ওপর কোনো দুঃখ-দৈন্য এসে পড়ে তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে একনিষ্ঠভাবে তার অভিমুখী হয়ে; অতঃপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ভুলে যায় সে কথা, যার জন্য পূর্বে তাকে ডেকেছিল এবং আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে, যাতে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে। *(সূরা যুমার, আয়াত নম্বর-৮)*

জরথুস্ত্রীয় ধর্মে স্রষ্টা

প্রাচীন আর্য ধর্মের অন্তর্গত একটি হচ্ছে জরথুস্ত্রীয় ধর্ম। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। যদিও এ ধর্মমতের অনুসারীর সংখ্যা কম তবুও সারা বিশ্বে এর অনুসারির সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কম নয়। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি। ইরানের জরথুস্ত্র এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়। এ ধর্ম 'পারসি ধর্ম' হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো 'দসতির' ও 'আবেস্তা'। জরথুস্ত্রীর ধর্মে স্রষ্টাকে 'আহুরা মাজদা' বলা হয়। 'আহুরা' অর্থ প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ প্রাজ্ঞ। আর তাই 'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু।' 'আহুরা মাজদা' দ্বারা এক অদ্বিতীয় প্রভুকে বোঝানো হয়ে থাকে।

স্রষ্টার ৮টি গুণাবলী

জরথুস্ত্রীয় ধর্মের ধর্মগ্রন্থ দসতির অনুসারে স্রষ্টা বা 'আহুরা মাজদা'র ৮টি স্বতন্ত্র গুণাবলি রয়েছে। এগুলো হলো -

১. তিনি একক।
২. কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।
৩. তিনি আদি ও অন্তহীন।
৪. তাঁর কোনো আকার-আকৃতি নেই।
৫. তিনি মানবীয় ধারণা-কল্পনার বহু উর্ধ্বে।
৬. তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই।
৭. তিনি মানুষের নিজের চেয়েও নিকটতর।
৮. দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না এবং কল্পনা শক্তিও তাঁকে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

'আবেস্তা'য় স্রষ্টার ৪টি বৈশিষ্ট্য

'আবেস্তা' বর্ণিত 'গাথা' ও 'ইয়াসনায়' আহুরা মাজদা বা এক অদ্বিতীয় প্রভুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মতে যিনি প্রভু তিনি হচ্ছেন–

১. আহুরা মাজদা বা সৃষ্টিকর্তা
(ইয়াসনা ৩১ : ৭ ও ১১) (ইয়াসনা ৪৪ : ৭) (ইয়াসনা ৫০ : ১১) (ইয়াসনা ৫১ : ৭)

২. সর্বশক্তিমান- তথা শ্রেষ্ঠ
যার অর্থ –*(ইয়াসনা ৩৩ : ১১), (ইয়াসনা ৪৫ : ৬)*

৩. 'হুদাই' করুণাময়– *(ইয়াসনা ৩৩ : ১১) (ইয়াসনা ৪৮ : ৩)*

৪. 'স্পেন্তা' বা দানশীল– *(ইয়াসনা ৪৩ : ৪,৫,৭,৯, ১১,১৩,১৫) (ইয়াসনা ৪৪ :২) (ইয়াসনা ৪৫ : ৫) (ইয়াসনা ৪৬ : ৯) (ইয়াসনা ৪৮ : ৩)*

ইয়াহুদি ধর্মে স্রষ্টা

ইয়াহুদি ধর্ম সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এর অনুসারীদেরকে 'ইয়াহুদি' নামে অভিহিত করা হয়। তারা নিজেদেরকে মূসা (আ) প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

Contents

ওল্ড টেস্টামেন্টে স্রষ্টার গুণাবলী

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এর 'ডিওটারেনমি' অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা (আ) এর উপদেশনামায় উল্লেখ আছে–

❒ "শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইশাদ।"

এটা হিব্রু ভাষার বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে উদ্ধৃত একটা শ্লোক। এর অর্থ– "ইসরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক।" *(বাইবেল, ডিওটারেনমি ৬:৪)*

বাইবেলের 'ঈসাইয়্যাহ' অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ করুন–

❒ "আমি, আমিই একমাত্র প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোনো ত্রাণকর্তা নেই।" *(বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩ : ১১)*

❒ "আমি-ই প্রভু, এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই; আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।" *(বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৫ : ৫)*

❒. "আমি-ই প্রভু এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই; আমি-ই প্রভু এবং আমার সদৃশ কেউ নেই।" *(বাইবেল, ঈসাইয়াহ ৪৬ : ৯)*

❒ "আমার পাশপাশি তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূ-গর্ভে কিংবা জলে আছে এমন কোনো কিছুর সদৃশ স্থির করবে না; তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না, আর না তাদের দর্শন করবে; কেননা আমি-ই একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর...।"

(বাইবেল, এক্সোডাস ২০ : ৩-৫)

অর্থাৎ ইয়াহুদি ধর্মে প্রতিমা পূজাকে শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে। বাইবেলের ডিওটারোনমিতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে–

"আমার পাশাপাশি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি কোনো কিছুর প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা উর্ধ্বাকাশে, পৃথিবীতে অথবা ভূ-গর্ভে কিংবা জলে যা কিছু আছে তার কোনো কিছু সদৃশ তৈরি করবে না; এসবের সামনে তুমি কখনো বিনীত হবে না, আর তাদের উপাসনাও করবে না; কেননা, আমি একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর ....।" *(বাইবেল, ডিওটারোনমি ৫ : ৭ - ৯)*

খ্রিস্টধর্মে স্রষ্টা

খ্রিস্টধর্ম একটি সেমিটিক ধর্ম। খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে সারা বিশ্বে রয়েছে এ ধর্মের প্রায় দুই শত কোটি অনুসারী। এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে যীশু খ্রিস্ট তথা ঈসা (আ) এর নামানুসারে। ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত

ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা (আ) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাই খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ইসলামে ঈসা (আ) এর মর্যাদা আলোচনার দাবী রাখে।

ইসলামে ঈসা (আ) এর মর্যাদা

❒ অ-খ্রিস্টান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যাতে ঈসা (আ) এর ওপর বিশ্বাস পোষণ করাকে ঈমান তথা বিশ্বাসের অপরিহার্য মৌলিক নীতি হিসেবে মনে করা হয়। ঈসা (আ) কে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে কোনো মুসলিম-ই পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে না। কেননা–

❒ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন মর্যাদাবান নবী ছিলেন, যার ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে।

❒ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোনো পুরুষের সংস্রব ছাড়া অলৌকিকভাবে পিতৃবিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন, যা আধুনিককালের অনেক খ্রিস্টান মানতে চান না।

❒ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন।

❒ আমরা বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দানে সক্ষম ছিলেন।

মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ধারণাগত পার্থক্য

মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ই যদি ঈসা (আ) কে ভালোবাসে ও সম্মান করে, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়– প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন আসতেই পারে। ইসলামও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ) কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম স্বীকার করে না। খ্রিস্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, ঈসা (আ) কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সম্বলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর' অথবা 'আমাকে উপাসনা করো।' বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাক বাইবেলে উদ্ধৃত তার বাক্যগুলোতে কী আছে–

❒ "My Father is Greater than I."

অর্থ– "আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।" *(যোহন ১৪ : ২৮)*

❒ "My Father is Greater than all."

অর্থ– "আমার পিতা সকলের চেয়ে মহান।" *(যোহন ১০ : ২৯)*

"Contents"

□"... I cast out devils by the spirit of God..."
অর্থ–"... আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে...।"(মথি ১২ : ২৮)
□"...With the finger of God cast out devils..."
অর্থ–"... ঈশ্বরের সাহায্যেই আমি মন্দ দূর করি।" *(লূক ১১ : ২০)*

যীশু খ্রিস্টের মিশন

যীশু কখনো নিজের ঐশ্বরিকতার দাবি করেননি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে 'ঈশ্বর' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে দাবি করেননি। তিনি তাঁর মিশনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন। ইতিপূর্বের কিতাব তাওরাতকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন, যা ইয়াহুদিদের হাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মথি লিখিত সুসমাচারের (Gospel) নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঈসা (আ) এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

□"তোমরা মনে করো না যে, আমি আইন তথা মূসা (আ) এর তাওরাতের বিধান অথবা নবীদের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি। আমি ধ্বংস করতে আসিনি, বরং সেসব পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি– আকাশ ও পৃথিবী যতদিন চলতে থাকবে ততদিন সেই বিধানের কোনো একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়।"

□'আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি তেমন-ই বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কেননা আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে চাই না; বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার ইচ্ছা অনুসারেই আমি কাজ করতে চাই।"

□"অতঃপর যে কেউ এসব বিধানের ছোট একটি বিধানও অমান্য করবে এবং মানুষকে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে সবচেয়ে ছোট মনে করা হবে। অপরদিকে যে কেউ বিধানসমূহ পালন করবে এবং মানুষকে তা পালন করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান মনে করা হবে।" *(বাইবেল, মথি ৫ : ১৭-২০)*

যীশু স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ

বাইবেল বেশ কিছু শ্লোকে যীশুর মিশনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নিয়ে সূত্রসহ উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করা হলো।

□"... and the word which ye hear is not mine, but the Father's which has sent me."
অর্থ ঃ "... এবং তোমরা যা আমার থেকে শোনো, তা-তো আমার কথা নয়, বরং সেসব কথা পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" *(বাইবেল যোহন ১৪ : ২৪)*

□"And this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus christ, whom thou has sent."
অর্থ : "এবং এটাই শাশ্বত জীবন যে, তারা তোমাকে তথা সত্য ঈশ্বরকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রিস্টকে জানবে।" *(বাইবেল যোহন ১৭ : ৩)*
□ যীশু তার ওপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাইবেলে উল্লিখিত নিচের ঘটনার প্রতি লক্ষ করলে তা যে কেউ বুঝতে সক্ষম। বাইবেলে বলা হয়েছে–

"And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"
And he said unto him— "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God; but if thou will enters into life, keeps the commandments."

অর্থ : "এবং দেখো, একজন লোক আসলো এবং যীশুকে বললো– ওহে ভালো প্রভু! আমাকে এমন ভালো কাজ সম্পর্কে বলুন, যা করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো।'

যীশু তাকে বললেন, "আমাকে ভালো বলছো কেন, একক ছাড়া কেউ ভালো নেই, আর তিনি হলেন 'ঈশ্বর'; তুমি যদি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও, তবে তাঁর সব আদেশ পালন করো।'

বাইবেলে উপস্থাপিত উপরোক্ত ঘটনাটি যীশুর 'ঈশ্বর' হওয়া সংক্রান্ত খ্রিস্টানদের মতবাদ এবং যীশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে। মথির বর্ণনা অনুসারে যীশু মানবজাতির চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। *(বাইবেল; মথি ৫ : ১৭-২০ দ্রষ্টব্য)*

যীশু স্রষ্টার মনোনীত ব্যক্তি

বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ ইসলামি এ বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে যীশু আল্লাহর নবী ছিলেন–

"Yemen of Israel, hear these words : Jessus of Nazareth, man approaved of God among you by miracles and wonders and sings, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know."

অর্থ : "হে ইসরাঈলীরা এ কথাগুলো শোনো : নাজারাথবাসী যীশু ঈশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের অলৌকিক, আশ্চর্যজনক নিদর্শন। ঈশ্বর তার দ্বারা যা করেছেন তা তোমাদের মধ্য থেকেই করেছেন যা তোমরা নিজেরাই জানো।'

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ বাইবেল কখনো সমর্থন করে না। একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি? এর উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা (আ) বলেছিলেন–

'শামা ইসরাঈলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত'–

এটা একটা হিব্রু উদ্ধৃতি যার অর্থ হলো–

'হে ইসরাঈলীরা শোনো! আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু।' *(মার্ক ১২ : ২৯)*

ইসলামে আল্লাহর অস্তিত্ব

কুরআন ও অপরাপর আসমানী কিতাবসমূহে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া রয়েছে। সারা বিশ্বে ইসলামের প্রায় একশত বিশ কোটি অনুসারী রয়েছে। এটি একটি সেমিটিক ধর্ম। 'ইসলাম' অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। মুসলিমজাতি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করে, যা হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর নাযিল করা হয়েছিল। ইসলাম বলে যে, আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে একত্ববাদের দাওয়াত এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জবাবদিহিতার বার্তাসহ তাওহীদের নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। সুতরাং, ইসলাম অতীতকালের সকল নবী-রাসূল তথা আদম (আ) থেকে শুরু করে যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাদের সকলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে তার বিশ্বাসের মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন– হযরত নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), মূসা (আ), দাউদ (আ), ইয়াহইয়া (আ) ও ঈসা (আ) এবং অন্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম।

আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কুরআন মাজীদের ১১২ নং সূরা ইখলাসের চারটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে –

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - বলুন, তিনি আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)।

২. اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - তিনি কাউকে জন্মদান করেননি, কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি।

৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। *(সূরা ইখলাস : ১-৪)*

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'আস-সামাদ' আরবি শব্দটির যথার্থ অনুবাদ একটু কঠিন। তবে এর মূল অর্থের কাছাকাছি অর্থ হলো Absolute existence অর্থাৎ পরম অস্তিত্ব। এই বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কেননা অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্থায়ী ও শর্তসাপেক্ষ। এ শব্দ দ্বারা এ অর্থ প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং সকল ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর ওপরই নির্ভরশীল এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সূরা ইখলাসে আল্লাহর পরিচয়

পবিত্র কুরআনের ১১২তম সূরা ইখলাসকে কুরআন মাজীদের কষ্টিপাথর বলা যায়। কারণ সূরা ইখলাসেই রয়েছে স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়।

গ্রিক ভাষার 'থিও' অর্থ ঈশ্বর আর 'লজি' অর্থ জ্ঞানার্জন। 'থিওলজি' অর্থ ঈশ্বর তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত বিদ্যা। সূরা ইখলাসের এ চারটি লাইন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক উপাস্যের দাবিদারকে অবশ্যই এ সূরার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হবে। আল্লাহর যে পরিচয় সূরাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার আলোকে মিথ্যা দেব-দেবী এবং ঐশ্বরিকতার দাবিদারের মিথ্যা দাবি অত্যন্ত সহজেই নাকচ হয়ে যায়।

স্রষ্টার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় উপমহাদেশকে বলা হয় মানব-ঈশ্বরের দেশ। কারণ, এখানে রয়েছে অগণিত তথাকথিত আধ্যাত্মিক গুরু। এ সকল গুরু এবং বাবার অনুসারীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা জানি, মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করাকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না বরং ঘৃণা করে। মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান বোঝার জন্য এরূপ এক মানব-ঈশ্বর 'ভগবান রজনীশ' সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

মানুষের স্রষ্টা হওয়া অসম্ভব

রজনীশ হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আধ্যাত্মিক গুরু। ১৯৮১ সালের মে মাসে তিনি আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে 'রজনীশপুরম' নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি পাশ্চাত্যের রোষানলে পড়েন ও গ্রেফতার হন। অবশেষে তিনি সে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি দেশে ফিরে

Contents

আসেন এবং তার জন্মভূমি 'পুনা'-তে 'ওশো' নামে আরেকটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওশোতে রজনীশের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানবরূপ তথা অবতার। একজন পর্যটক 'ওশো' জনপদে ভ্রমণ করলে দেখতে পাবে তাঁর অনুসারীরা তাঁর সমাধি-ফলকে পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে– 'ওশো রজনীশ কখনো জন্মগ্রহণ করেননি। কখনো মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি কেবল পৃথিবী গ্রহটি পরিদর্শন করে গেছেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত'।

সম্ভবত তারা এটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে, তাঁকে পৃথিবীর ২১টি বিভিন্ন দেশের ভিসা দেয়া হয়নি। রজনীশের অনুসারীরা এটাকে কোনো সমস্যা হিসেবে মনে করেনি যে তারা যাকে 'পৃথিবী ভ্রমণকারী অবতার' বলে বিশ্বাস করে তাকে কোন দেশে প্রবেশ করার জন্য সে দেশের অনুমতি তথা ভিসার প্রয়োজন হয়! গ্রীসের আর্চ বিশপ বলেছেন, রজনীশ যদি সেদেশ থেকে বের হয়ে না যায় তাহলে তারা তার শিষ্য-সাগরেদসহ রজনীশের বাসস্থান জ্বালিয়ে দেবেন।

এবার ভগবান রজনীশের 'অবতার' হওয়ার দাবিকে সূরা ইখলাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখা যাক–

প্রথম মানদণ্ড– "বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।" রজনীশ কি এক ও অদ্বিতীয়? এর উত্তরে বলতে হবে- 'না'। রজনীশের মতো অনেকেই ঈশ্বরের অবতার হওয়ার দাবি করেছে। রজনীশের কয়েকজন শিষ্য এখনো এ দাবির উপর অটল রয়েছে যে রজনীশ এক ও অদ্বিতীয়।

দ্বিতীয় মানদণ্ড– 'আল্লাহ পরম অস্তিত্বশীল ও মুখাপেক্ষীহীন।' নিশ্চয়ই রজনীশ পরম অস্তিত্বশীল ছিলেন না। কেননা তিনি ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। রজনীশের জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও পুরাতন শিরদাঁড়ার ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আমেরিকান সরকার তাঁকে কারাগারে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করেছেন এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, সর্বশক্তিমান ভগবানকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে! সুতরাং, রজনীশ যেমন চিরঞ্জীব ছিলেন না, তেমনি তিনি মুখাপেক্ষীহীনও ছিলেন না।

তৃতীয় মানদণ্ড– 'আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি।' আমরা জানি, রজনীশ ভারতের জবলপুরে এক পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থ মানদণ্ড– 'আল্লাহর সদৃশ সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।' ঈশ্বরত্বের দাবিদার কাউকে যদি কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার ঈশ্বরত্ব তাৎক্ষণিক বাতিল বলে গণ্য হবে। সত্যিকার একক আল্লাহর কোনো কাল্পনিক আকার-আকৃতি কল্পনা করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমরা জানি, রজনীশ রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন। তিনি ছিলেন শুভ্র লম্বা দাড়ির অধিকারী। তার ছিল দুটি চোখ, দুটি কান, একটি নাক, একটি মুখ। রজনীশের ছবি সম্বলিত পোস্টার প্রচুর পাওয়া যায়। এতে এটা সহজেই ধারণা করা যায় যে তিনি 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' হতে পারেন না।

একইভাবে যে ব্যক্তিটি শারীরিক শক্তিমত্তা হেতু 'মিস্টার ইউনিভার্স' উপাধিপ্রাপ্ত তাকেও কেউ 'ঈশ্বর' হিসেবে কল্পনা করতে পারে বটে, কিন্তু সূরা ইখলাসে বর্ণিত ৪টি মানদণ্ডের আলোকে একমাত্র একক অদ্বিতীয় 'আল্লাহ' ছাড়া কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেন না।

স্রষ্টা একক সত্তা

একক সৃষ্টিকর্তাকে ইংরেজি শব্দ 'গড' এর পরিবর্তে 'আল্লাহ' নামেই মুসলমানরা ডাকে। 'গড' এর চেয়ে আরবি শব্দ 'আল্লাহ'-ই সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও যথার্থ। 'গড' শব্দের সাথে 'এস' ইংরেজি বর্ণ যুক্ত করে তাকে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা যায়; কিন্তু 'আল্লাহ' একক সত্তা। এ শব্দের কোনো বহুবচন হয় না। আবার 'গড' এর সাথে 'ই-এস' ইংরেজি বর্ণ যোগ করলে তা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনো পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। 'আল্লাহ' শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না। 'গড' শব্দের আগে Tin শব্দাংশ যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'মিথ্যা উপাস্য'। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শব্দ যা সম্পর্কে কল্পনা করে কোনো আকৃতি বা আকার ধারণা করা বা তা নিয়ে কোনো প্রকার যথেচ্ছাচার করা যায় না। এসব কারণে মুসলমান এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। তবে যেহেতু এই বইয়ের পাঠক বা সম্বোধিত মানুষ সাধারণভাবে মুসলমান ও অমুসলমান উভয় প্রকার রয়েছে, তাই আমি এতে 'আল্লাহ' শব্দের বদলে 'গড' শব্দটি-ই অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছি।

স্রষ্টা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না

গভীরভাবে চিন্তা না করেই কিছু লোক যুক্তি পেশ করে যে, ঈশ্বর যদি সবকিছু করতে সক্ষম, তবে তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারবেন না কেন? তিনি যদি

Contents

ইচ্ছে করেন তবে তিনি মানব-আকৃতি ধারণ করতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলে 'ঈশ্বর' আর ঈশ্বর থাকতে পারেন না। কেননা 'ঈশ্বর' আর মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী। একই সত্তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হতে পারে না। 'অবতারবাদ' বা ঈশ্বরের মানবাকৃতি ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ কোনো কোনো ধর্মে থাকলেও তা অবাস্তব।

আমরা জানি, 'ঈশ্বর' অবিনশ্বর কিন্তু মানুষ নশ্বর। মানব-ঈশ্বর নামক এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সত্তা নশ্বর মানবদেহ ধারণ করবে। এমন ধারণা বাস্তবতা বিবর্জিত, অর্থহীন ও অযৌক্তিক।

ঈশ্বর-এর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অনাদি ও অনন্ত। অন্যদিকে মানুষের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। এমন কোনো সত্তা মানুষের মধ্যে নেই যার মধ্যে শুরু না থাকা এবং শুরু থাকা উভয়ই বিদ্যমান আছে। মানুষের শেষ আছে, কারণ মানুষ মরণশীল। এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে অবিনশ্বরতা ও নশ্বরতা উভয় গুণের সমাবেশ পাওয়া যাবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষকে তার জীবন কর্মচঞ্চল রাখার জন্য পানাহার করতে হয়। অতএব স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা আল্লাহর মানবরূপ ধারণ সংক্রান্ত মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۔

অর্থ : তিনি খাদ্য দান করেন, কিন্তু তিনি খাদ্যগ্রহণ করেন না। *(সূরা আনআম : ১৪)*

অর্থাৎ আল্লাহর কখনো বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রয়োজন হয় না; অথচ মানুষ বিশ্রাম ও নিদ্রা ছাড়া চলতে পারে না।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۔

অর্থ : আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। *(সূরা বাকারা : ২৫৫)*

মানব-ঈশ্বরের উপাসনা অযৌক্তিক

'ঈশ্বরে'র মানবরূপ ধারণ তথা অবতারবাদ যেহেতু গ্রহণীয় নয় তাই আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে একমত হবো যে, কোনো মানুষের উপাসনা করা অযৌক্তিক। এরূপ কর্মকাণ্ড নিষ্ফল ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর যদি মানব-আকৃতি ধারণ করেন,

তাহলে তিনি অবশ্যই ঐশ্বরিক গুণাবলি ত্যাগ করেই মানবরূপ ধারণ করবেন এবং তিনি মানুষের মধ্যকার সমস্ত গুণের অধিকারী হবেন। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, একজন মেধাবী অধ্যাপক যদি দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে এ অবস্থায় তার ছাত্রদের পক্ষে তাঁর নিকট তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায়, ঈশ্বর যদি মানবরূপ ধারণ করেন, তাহলে এ মানুষটি আর কখনো তার পূর্বরূপ ঈশ্বরত্বে ফিরে যেতে পারবেন না। কেননা মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মানব-ঈশ্বর এর উপাসনা করা অযৌক্তিক এবং তা অবশ্যই নিষ্ফল।

এ জন্যই কুরআন মাজীদে সর্বপ্রকার মানব-ঈশ্বর বা অবতারবাদের অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিরূপ নির্ধারণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۔

অর্থ : কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। *(সূরা শুরা : ১১)*

স্রষ্টা অন্যায় ও অশোভন কাজ করেন না

'ঈশ্বর' সর্বশক্তিমান যিনি ন্যায়বিচার, করুণা, সত্য, অনন্ত ও অনিন্দ্যনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি কখনো এমন সৃষ্টিসুলভ কাজ করতে পারেন না, যা তাঁর সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। তদ্রূপ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার মিথ্যা কথা বলার ধারণাও করা যায় না। একইভাবে অন্যায়, ভুল, কোনো বিষয়ে স্মৃতিভ্রম ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়ার কথাও কল্পনা করা যায় না। তবে 'ঈশ্বর' যদি ইচ্ছা করেন তাহলে অন্যায় করতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনো তা করেন না, করবেনও না, যেহেতু এটা অন্যায় সেহেতু এমন অন্যায় কাজ তাঁর জন্য অশোভন। এ সম্পর্কে মানবজাতির জ্ঞানের বাহক আল কুরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۔

অর্থ : আল্লাহ কখনো এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। *(সূরা নিসা : ৪০)*

ঈশ্বর চাইলে অত্যাচারী হতে পারেন কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি অন্যায়কারী হবেন সেই মুহূর্তেই তিনি হারাবেন তাঁর ঐশ্বরিকতা।

ভুলে যাওয়া ও ভুল করা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয়

ঈশ্বর কখনো ভুলে যেতে পারেন না। কেননা ভুলে যাওয়া স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার উদাহরণ। একইরূপে ঈশ্বর ভুল করতে পারেন না। কেননা ভুল করা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এ সম্পর্কে

মানবজাতির পথ প্রদর্শক পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى .

অর্থ : আমার প্রভু বিভ্রান্তও হন না, ভুলেও যান না। *(সূরা তা-হা : ৫২)*

ঈশ্বর ঈশ্বরসুলভ কাজই করেন। ঈশ্বরের সবকিছু করার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে ইসলামের ধারণা হলো– 'ঈশ্বরের ক্ষমতা সবকিছুর ওপর বিরাজমান।'

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

অর্থ ঃ আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(আল-কুরআন– ২ : ১০৬, ২ : ১০৯, ২ : ২৮৪, ৩ : ২৯, ১৬ : ৭৭, ৩৫ : ১)

কুরআন মাজিদ আরো বলে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ .

অর্থ : তিনি যা চান তা-ই করেন। *(সূরা বুরুজ : ১৬)*

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজেরই ইচ্ছা করেন এবং তা সম্পাদন করেন। অন্যায় এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলির বিপরীত কাজ তিনি করেন না।

অনেক ধর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো পর্যায়ে অবতারবাদে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব আকৃতি ধারণ করেন। তাদের যুক্তি হলো- সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর' অত্যন্ত পবিত্র, সত্য, পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ। তাই তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা ও অনুভূতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অতএব, মানুষের জন্য নীতি-নিয়ম প্রণয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হন। যুগে যুগে এ প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। এ যুক্তিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এটা কতটুকু যৌক্তিক।

স্রষ্টাই দিকনির্দেশক ও বিধিমালা প্রণেতা

মহান স্রষ্টা আমাদেরকে মানবীয় গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে আমরা বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে নিয়েছি। যেমন– টেপরেকর্ডার। টেপরেকর্ডার এমনই একটি যন্ত্র যা শিল্প-কারখানায় বহুল পরিমাণে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কি কখনো বলা হয়েছে যে, টেপরেকর্ডারের কী ভালো, আর কী মন্দ, তা জানার জন্য প্রস্তুতকারককে টেপরেকর্ডারের রূপ ধারণ করতে হবে? বরং এটাই স্বাভাবিক যে, প্রস্তুতকারক তার এ যন্ত্রের উৎপাদন ও চালানোর নিয়ম-পদ্ধতি ও বিধিমালা সম্বলিত একটি ক্যাটালগ (ম্যানুয়েল) তৈরি করবেন। যার মাধ্যমে এ যন্ত্রের ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়মাবলি পেতে পারে। এ পুস্তকের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া থাকবে যে, এ যন্ত্র কী পদ্ধতিতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা

যাবে, আর কীভাবে ব্যবহার করলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষকে যদি তেমনি একটি যন্ত্র বলে ধরে নেন, তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই দুনিয়াতে এসে মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ তা জানার। তবে এটা নিশ্চিত যে, তিনি মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা গ্রন্থ (ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল) দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন-ই মানবজাতির জন্য সেই গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা শেষ বিচারের দিন তাঁর এ সুনিপুণ সৃষ্টির কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তিনি যে বিষয়ে হিসাব নেবেন, সে বিষয়ে পূর্ণ নির্দেশিকা আগেই পাঠিয়ে দেবেন। তাই তিনি পবিত্র কুরআন নাযিল করে দুনিয়ার জীবনে মানুষের কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা যথারীতি জানিয়ে দিয়েছেন।

স্রষ্টা তাঁর রাসূল মনোনীত করেন

মানবজাতিকে তাঁর কল্যাণের জন্য প্রদত্ত বিধি-বিধান জানিয়ে দেয়ার জন্য স্রষ্টার স্বয়ং দুনিয়াতে আসার প্রয়োজন হয় না। তিনি প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠির মধ্য থেকে বাছাই করা মানুষদের মাধ্যমে তাঁর আসমানি বিধি-বিধান দুনিয়াতে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। স্রষ্টার বাছাই করা ও মনোনীত এসকল মানুষদের 'বার্তাবাহক' বা 'নবী-রাসূল বলা হয়।

'অন্ধ' ও 'বধির' লোকেরা শিক্ষা নেয় না

অবাক ব্যাপার যে, অবতারবাদী দর্শনের অসম্ভাব্যতা ও অযৌক্তিতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অনেক অনুসারীরা নিজেরাও এ অবতারবাদে বিশ্বাস করে এবং অন্যদেরকেও এটা শিক্ষা দেয়। এটা কি মানুষের বুদ্ধিমত্তা (ইন্টেলিজেন্স) এবং যিনি মানুষকে এ বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন তাঁর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন নয়? এ সমস্ত লোকই প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ' ও 'বধির', যদিও আল্লাহ তাদেরকে শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

অর্থ : তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না।

(সূরা বাকারা : ১৮)

মথি বাইবেলের লিখিত সুসমাচারে একই কথা বলেছে–

অর্থ : তারা দেখেও দেখে না এবং শুনেও শোনে না, তারা বুঝতেও সক্ষম নয়।

(মথি ১৩ ঃ ১৩)

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'ঋগবেদে'ও একই ধরনের বক্তব্য রয়েছে–

অর্থ : এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বাণীসমূহ দেখে, প্রকৃতপক্ষে তারা দেখে না; এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বাণীসমূহ শোনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না। *(ঋগবেদ ১০ : ৭১ : ৪)*

পবিত্র গ্রন্থের এসব বাণী তাদের পাঠকদের বলে যে, যদিও স্রষ্টা বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তবুও এরা বিচ্যুতই হয়ে যাবে সত্য থেকে।

Contents

স্রষ্টার গুণাবলি

মানবজাতির সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব পবিত্র কুরআনের বনী ইসরাঈল এর ১১০ নং আয়াতে স্রষ্টাকে কী নামে সম্বোধন করতে হবে, তা স্পষ্ট ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে - قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

অর্থ : বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাক কিংবা 'রাহমান' বলে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।

একই ধরনের কথা কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। *[দ্রষ্টব্য: সূরা আ'রাফ (৭ : ১৮) ; সূরা ত্বা-হা (২০ : ৮) এবং আল-হাশর (৫৯ : ২৩-৪)]*

এভাবে আল-কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯টি বিভিন্ন গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো 'আল্লাহ'। কুরআন 'আল্লাহ'র পরিচয় প্রকাশে অনেক নামের মধ্যে 'আর-রাহমান' (পরম করুণাময়) 'আর-রাহীম' (পরম দয়ালু) 'আল-হাকীম' (সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান) প্রভৃতি নাম উল্লেখ করেছে। আপনি যে কোনো নামেই আল্লাহকে ডাকতে পারেন ; কিন্তু সেই নামগুলো হতে হবে সুন্দর। তবে সেই নামগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে মানসপটে কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো চিত্র যেন ফুটে না ওঠে।

গুণবাচক নামের মালিক স্বয়ং আল্লাহ

মহান আল্লাহ তাআলা সুন্দর নামসমূহের অধিকারী। প্রত্যেকটি নামের মধ্যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উদাহরণ পেশ করা যাক। ধরুন নভোচারি নীল আর্মস্ট্রং। কেউ যদি বলে, 'নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান'। উক্তিটি যথার্থ ; কিন্তু তার পরিচয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। 'নীল আর্মস্ট্রং একজন নভোচারী'- এ পরিচয়ও তার জন্য অনন্য পরিচয় নয়, কেননা এ পরিচয় অন্যদেরও আছে। যদি বলা হয় যে, 'নীল আর্মস্ট্রং প্রথম ব্যক্তি যিনি চাঁদে পা রেখেছেন'। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যে চাঁদে প্রথম পদার্পণ করেছেন কে? উত্তরে কেবল বলা হবে 'নীল আর্মস্ট্রং'। এ কৃতিত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার গুণাবলিও হতে হবে অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা। আমি যদি বলি– 'তিনি ইমারতের নির্মাণকারী' তাহলে তাঁর পরিচয় হিসেবে অনন্য নয়, কেননা অনেক মানুষ ইমারতের নির্মাতা হতে পারে। অতএব 'নির্মাতা' গুণ দ্বারা স্রষ্টার ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে না। স্রষ্টা বা আল্লাহর

গুণসমূহ এমন হবে যার দ্বারা তাঁকেই নির্দেশ করবে অন্য কাউকে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ–

اَلرَّحْمٰنُ 'আর-রাহমান' (পরম করুণাময়),

اَلرَّحِيْمُ 'আর-রাহীম' (পরম দয়ালু),

اَلْحَكِيْمُ 'আল-হাকীম' (সর্বাধিক প্রজ্ঞাবান).

প্রভৃতি বিশেষ গুণবাচক নামগুলোর উল্লেখ করা যায়। সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে– اَلرَّحْمٰنُ আর-রহমান বা পরম করুণাময় কে? তাহলে এর উত্তরে একটি মাত্র জবাবই হতে পারে – 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'।

স্রষ্টার গুণাবলী সাংঘর্ষিক নয়

পূর্বের উদাহরণটিকে ধরা যাক। কেউ যদি বলে, "নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান নভোচারী যিনি মাত্র চার ফুট লম্বা' তবে এ পরিচয় 'আমেরিকান নভোচারী' যথার্থ, কিন্তু সহায়ক গুণটি 'চার ফুট লম্বা' মিথ্যা। একইভাবে কেউ যদি বলে আল্লাহ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর একটি মাথা, দুটো হাত, দুটো পা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য তথা 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা' বৈশিষ্ট্যটি যথার্থ ; কিন্তু সহায়ক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ, 'মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া' ভুল এবং মিথ্যা।

গুণ-বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার একক সত্তার পরিচায়ক

আল্লাহ যেহেতু এক ও অদ্বিতীয়, তাই তাঁর সব গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা একমাত্র তাকেই নির্দেশ করাটা স্বাভাবিক। যদি বলা হয়, 'নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন নভোচারী যিনি চাঁদের বুকে প্রথম পদার্পণ করেন; কিন্তু পরে দ্বিতীয় জন এডউইন অলড্রিন – একথাটা সঠিক নয়। কেননা প্রথম পদার্পণকারী একজনই হতে পারে। প্রথম পদার্পণকারী দ্বিতীয় হতে পারে না। সুতরাং স্রষ্টা এক ঈশ্বর এবং প্রতিপালক অন্য ঈশ্বর – এ বক্তব্য অবাস্তব; কারণ, বিশ্বজগতে স্রষ্টার এক ও অদ্বিতীয়- যাবতীয় মহৎ গুণ স্রষ্টার একক সত্তার পূর্ণতা লাভ করেছে।

স্রষ্টার এককত্বই যৌক্তিক

বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক নয় বলে যুক্তি দেন বহু ঈশ্বরবাদীরা। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি পেশ করা যায় যে, বিশ্ব-জগতের যদি একাধিক ঈশ্বর থাকতো, তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো। প্রত্যেক ঈশ্বরই অন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে কার্যকর করতে চাইতেন। এরই

প্রতিক্রিয়া ও প্রমাণ মেলে বহু ঈশ্বরবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় উপাখ্যানগুলোতে। যদি এক ঈশ্বর অন্য ঈশ্বরের নিকট পরাজিত হন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হন, তাহলে তিনি 'ঈশ্বর' হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। ফলে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরও হতে পারেন না। বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে বহু ঈশ্বরের ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয়, কারণ সেখানে বিভিন্ন ঈশ্বরের বিভিন্ন দায়িত্ব। যেমন– সূর্যদেবতা, বৃষ্টির দেবতা ইত্যাদি। তাদের প্রত্যেকে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিভিন্ন ঈশ্বর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ বর্ণনা একথার ইঙ্গিত দেয় যে, এসব ঈশ্বরের কেউই সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের এককভাবে যোগ্য নয়। অধিকন্তু এক ঈশ্বরের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অন্য ঈশ্বর কিছুই জানেন না। একটি অজ্ঞ ও অক্ষম সত্তা 'ঈশ্বর' হতে পারেন না। যদি ঈশ্বর একাধিক হতো, তাহলে মহাবিশ্বে অবশ্যই সংশয়, বিশৃঙ্খলা, গোলমাল ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতো।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

অর্থ : যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 'ইলাহ' থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব আরশের অধিপতি আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা বলে থাকে। *(সূরা আম্বিয়া : ২২)*

একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে তারা তাদের সৃষ্ট ও আয়ত্তাধীন রাজত্ব নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেতো। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ - سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ কাউকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো 'ইলাহ'-ও নেই; (যদি অন্য ইলাহ থাকতো) তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অবশ্যই পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। আল্লাহ পবিত্র মহান (তিনি মুক্ত) তা থেকে যা তারা বলে। *(সূরা মুমিনূন : ৯১)*

সুতরাং, এক ও অদ্বিতীয় সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকাটাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি।

কিছু ধর্ম রয়েছে অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী, যেমন বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় ধর্ম। অজ্ঞেয়বাদ (অ্যাগনস্টিক) এর মূলকথা হলো– 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো কিছু আমাদের জানা নেই। সুতরাং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না– এটা হলো অজ্ঞেয়বাদের ধারণা। তারা 'স্রষ্টার'-এর অস্তিত্ব স্বীকারও করে না আবার অস্বীকারও করে না। অপর কিছু ধর্ম আছে যেমন জৈন ধর্ম – এগুলো নাস্তিক্যবাদী ধর্ম। এরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

একত্ববাদ

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মই মূলত এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টায় বিশ্বাসী। সকল ধর্মগ্রন্থই একত্ববাদের কথা বলে অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় সত্য-স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। এ একত্ববাদই ইসলামে 'তাওহীদ'।

মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন করেছে

প্রায় সব ধর্মগ্রন্থই কালের প্রবাহে তাদের অনুসারীদের নিজেদের স্বার্থে বিকৃত ও পরিবির্তত হয়ে গেছে। সকল ধর্মের মূল কথা বিকৃত হয়ে একত্ববাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদে অথবা বহু ঈশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا - فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থ : সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ', যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য পেতে পারে। কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্য। *(সূরা বাকারা : ৭৯)*

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। যার অর্থ কেবল 'একেশ্বরবাদ' তথা কেবল এক-অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করাই নয়। 'তাওহীদ' আক্ষরিক অর্থে সংযোগ সাধন করাকে বলা হয়। "تَوْحِيْدٌ" শব্দটি "وَحْدَةٌ" (ওয়াহ্‌দাতুন) শব্দ থেকে উদগত। 'তাওহীদ' (تَوْحِيْدٌ) অর্থ একত্বের সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করা। তাওহীদ তিনটি শাখায় বিভক্ত–

ক. তাওহীদ আর-রবূবীয়াহ (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّة)

খ. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত এবং (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)

গ. তাওহীদ আল-ইবাদাহ। (تَوْحِيْدُ الْعِبَادَاتِ)

তাওহীদ আর-রবূবীয়াহ

তাওহীদের প্রথম শ্রেণী হলো তাওহীদ আর-রবূবীয়াহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। মূল শব্দ 'রাব্বুন' (رَبٌّ) থেকে 'রবূবীয়াহ' উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 'প্রভু' রক্ষাকারী ও প্রতিপালনকারী।

সুতরাং 'তাওহীদ আর-রবূবীয়াহ্' অর্থ প্রভুত্বের একত্ব-কে দৃঢ়তার সাথে মেনে নেয়া। এটা এ মৌলিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহই সকল বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। একমাত্র আল্লাহ দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল সব কিছুরই স্রষ্টা। বিশ্বে যা কিছু আছে এবং পুরো বিশ্বজগতের তিনি একক স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং রক্ষাকারী। তবে এই সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই।

তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত

তাওহীদের দ্বিতীয় শ্রেণী হলো– তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর মূল সত্তা ও একক গুণাবলীতে বিশ্বাস। এর অর্থ হলো– আল্লাহর মূল নাম ও গুণবাচক নামসমূহের একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। এ শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি দিক রয়েছে–

ক. আল্লাহ্ নিজে এবং তাঁর রাসূল যেসব নামে তাঁকে ডেকেছেন সে নামেই তাঁকে ডাকতে হবে। এসব নামসমূহের যে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহয় দেয়া হয়েছে, তার বিপরীত বা অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. আল্লাহকে সেই নামেই ডাকতে হবে, যে নাম তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে কোনো নব উদ্ভাবিত মূল বা গুণবাচক নামে কখনো ডাকা যাবে না। যেমন তাঁকে 'আল-গাদিব' (ক্রোধান্বিত) নামে ডাকা যাবে না, যদিও তাঁর ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখিত আছে। কেননা তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর রাসূল তাঁকে এ নামে নামাঙ্কিত করেননি।

গ. আল্লাহর গুণকে তাঁর সৃষ্টির গুণের সদৃশ মনে করা যাবে না। আমাদের অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির গুণকে তাঁর গুণের সদৃশ বলে মনে করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকতে হবে। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা তার মন্দ চিন্তার জন্য অনুশোচনা করেছেন, যেমন মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে', এটা তাওহীদের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ্ যেহেতু কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি করতে পারেন না, তাই তাঁর অনুশোচনার প্রশ্নই আসে না।

ঘ. আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থ : কোনো বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

(সূরা শূরা : ১১)

যদিও শোনা এবং দেখার ব্যাপার মানুষের সাথেও সংশ্লিষ্ট কিন্তু যখন তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন তার প্রকৃত রূপ কী হবে তা মানুষের জ্ঞানের আওতাধীন নয়। মানুষের শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব অঙ্গ ছাড়া তার শোনা ও দেখার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর মহান সত্তা সেসব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

ঙ. আল্লাহর কোনো অনুপম ও অতুলনীয় গুণকে মানুষের সাথে সংযুক্ত করা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন– কোনো মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে আদি ও অন্ত (চিরঞ্জীব) বলে বিশেষিত করা। আল্লাহর কোনো গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা যাবে না।

চ. আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো নামে তাঁর সৃষ্টির নামকরণ করা যাবে না। আল্লাহর কোনো কোনো গুণবাচক নামকে অনির্দিষ্টভাবে 'আল' (ال) যোগ না করে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– 'রাউফ' 'রাহীম'। আল্লাহ্ স্বয়ং কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ শব্দগুলোর সাথে আলিফ-লাম যুক্ত করে আর-রউফ, আর-রাহীম' মানুষের নামে যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তার আগে 'আব্দ' শব্দটি যুক্ত করে নিতে হবে। তখন তার অর্থ হবে- আবদুর রাউফ (রাউফের বান্দা বা দাস), আবদুর রাহীম (রাহীমের বান্দাহ বা দাস), অন্য কথায় আল্লাহর বান্দাহ বা আল্লাহর দাস।

তাওহীদ আল-ইবাদাহ

ক. 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' এর অর্থ ইবাদত-উপাসনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর একত্ব সংরক্ষণ করতে হবে। 'ইবাদাহ' আরবি 'আব্দ' (عَبْدٌ) শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ দাস বা চাকর। আর 'ইবাদাহ' (عِبَادَة) অর্থ দাসত্ব বা উপাসনা। صَلٰوة 'সালাত' বা নামায হলো দাসত্বের একটি আনুষ্ঠানিক রূপ; কিন্তু এটাই একমাত্র রূপ নয়। মানুষের একটি প্রচলিত ও ভুল ধারণা রয়েছে যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু ইসলামে ইবাদত বা উপাসনার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামে 'ইবাদত' হলো– আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। আর এ ইবাদতও কেবল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

খ. তাওহীদের উপরোল্লিখিত তিনটি শাখাই যুগপৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাওহীদের প্রথমোক্ত দুটি শাখায় বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যাবে যদি তৃতীয় শাখাকে তথা ইবাদতকে কার্যকর করা না হয়। কুরআন নবী (স) এর সমকালীন

মুশরিক তথা পৌত্তলিকদের উদাহরণ পেশ করেছে যারা তাওহীদের প্রথম দুটি শাখায় বিশ্বাসী ছিল।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ : আপনি জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমীন থেকে কে তোমাদেরকে রুজি দান করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং সকল বিষয়কে কে নিয়ন্ত্রিত করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

(সূরা ইউনুস : ৩১)

একই উদাহরণ পুনরুক্ত হয়েছে সূরা যুখরুফএ–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

অর্থ : আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন- কে তাদের সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। তবুও তারা উল্টো কোন্ দিকে চলছে?

(সূরা যুখরুফ : ৮৭)

মক্কার বিধর্মীরা জানতো যে আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও রিযিকদাতা। তবুও তারা মুসলিম ছিল না, কেননা তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য দেব-দেবীর পূজা করতো। আল্লাহ 'তাদের কুফফার' তথা অবিশ্বাসী এবং 'মুশরিকিন' তথা আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের তালিকাভুক্ত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ـ

অর্থ : তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সাথে তাঁর সাথে শরিক ও সাব্যস্ত করে। *(সূরা ইউসুফ : ১০৬)*

সুতরাং 'তাওহীদ আল-ইবাদাহ' তথা ইবাদতের ব্যাপারে এক আল্লাহর অধিকার সংরক্ষণ করা তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি একই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী এবং তিনিই মানুষকে ইবাদতের কল্যাণকর প্রতিদান দিতে পারেন।

অংশীবাদ

অংশীবাদ কী

অংশীবাদকে ইসলামে 'শিরক' বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে 'শিরক' হলো অংশীদার সাব্যস্ত করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা প্রতিমাপূজার সমতুল্য। এটি স্রষ্টার একত্ববাদ বা তাওহীদের পরিপন্থী।

অংশীবাদীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না

কুরআন মাজিদে সূরা নিসায় সবচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। অনন্তর যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করে সে মহাপাপ করে। *(সূরা নিসা : ৪৮)*

সূরা নিসায় একই কথা পুনরুক্ত হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, তিনি ঐ শিরক ছাড়া সব পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, অনন্তর কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা নিসা : ১১৬)*

অংশীবাদ নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে নিয়ে যায়

কুরআন মাজিদে সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

অর্থ : নিঃসন্দেহে তারা কুফরী করেছে, যারা বলে মরিয়ম– পুত্র মসীহই আল্লাহ, অথচ মসীহ বলেছিল, হে বনি ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার

Contents

পালনকর্তা এবং তোমাদেরও প্রতিপালক । নিশ্চয় যে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মায়িদা ঃ ৭২)*

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে হবে

প্রধান ধর্মসমূহের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে আমরা স্রষ্টার একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি। জানতে পেরেছি তাঁর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে। তাই একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يَاهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

অর্থ : আপনি বলে দিন! হে আহলে কিতাব! এসো সেই ঐক্যবাণীর ভিত্তিতে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন; তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি এবং কোন কিছুকেই যেন তার শরীক সাব্যস্ত না করি, আর আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ না করি। তৎপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে তোমরা তাদেরকে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম।'

more coming soon ……….